শেষ সপ্তক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
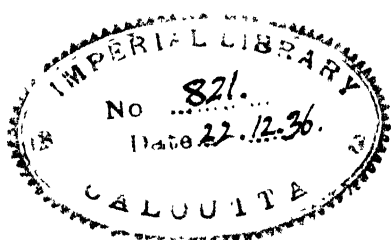
বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা
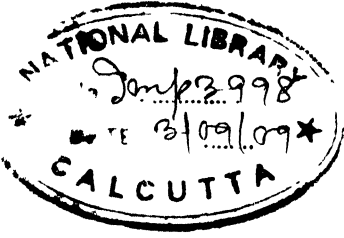
শেষ সপ্তক

প্রথম সংস্করণ .. ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪২।

মূল্য—২৲

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শেষ সপ্তক

সূচীপত্র

শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য করোনি দাবী।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে;
পরদিনে মনে রইল না।
নব বসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হোলো না
আরো যে আমার নেই।"
বল্‌তে বল্‌তে তোমার চোখ এল ছল্‌ছলিয়ে।
(আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে; রাতের পর রাত,
তুমি আসো না।)

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখ্‌ছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হোলো বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে॥

দুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃত রেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি।
জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হোলো
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধ-খোলা জানলায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চলতি গানে।

শেষ সপ্তক

অভূতপূর্ব্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়-তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জ্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে,
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তারপরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্য্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা॥

তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;
　কৌতূহলী ভোরের আলো
　　　কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে
　　　　ধরেছে কচি পাতা ;
　　　　　সে যেন আপনি বিস্মিত।
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
　　　আপনার প্রথম নিঃশ্বসিত ছন্দে
　　　　চকিত হয়েছিলেন নিজে,—
　　　　　তেমনি দেখ্‌লেম ওকে।

অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
　　　অরুণ আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
　　　　এইকয়টি কিশলয় ;

শেষ সপ্তক

সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বল্‌তে পারতে,
কিন্তু না ব'লে গিয়েছ চলে।
সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে ;
তোমার আমার মাঝখানে ছিল
আধ-চেনার যবনিকা ;
কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে ;
মাঝে মাঝে তা'র একটা কোণ গেল উড়ে ;
দুরন্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ বাতাস,
তবু সরাতে পারেনি অন্তরাল।
উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ ঘটল না ;
ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে॥

চার

যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ ;—
যাক্ কেটে, এর আবেশটুকু ;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ,
স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
স'রে যাক্ সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা ক'রে।

ঝ'রে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্ন-মৌমাছি
গুন্ গুন্ ক'রে বেড়ায়,
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।

শেষ সপ্তক

এই ছায়ার বেড়ায় বন্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
(কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।)

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।

শেষ সপ্তক

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগ্‌নি রঙের আঁচ্‌লা।
গাঙ্‌চিল উড়ে বেড়াচ্চে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।

শেষ সপ্তক

চঞ্চল বসন্তের অবসানে

আজ আমি অলস মনে

আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;

এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে

আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।

এর আলো ছায়ার উপর দিয়ে

ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলে যাক আমার চেতনা

চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন

মৃত্যু-মহাসাগর সঙ্গমে ॥
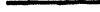
পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।
বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।

কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলেনি।
তার অভিষেক হোলো না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।

বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ঐ তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে ;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।

তেমনি ক'রে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবাব রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে ;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সঙ্কেত
অঙ্কিত হয় অন্তর-ফলকে।

নিরালায় জানলার কাছে বসেছি যখন
নিষ্কর্ম্মা প্রহরগুলো নিঃশব্দ চরণে
কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে ;
জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্ত্তের সঞ্চয়।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে ;
বলেছে,—যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা,—
বলেছে,—যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস,—
"এসো প্রকাশ, এসো।"

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে,
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য ক'রে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি ॥

ছন্দ

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি ;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।
অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে,
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা ;
ফুটো ঝুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে
বিশ্রাম ছিল না॥

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই।

শেষ সপ্তক

যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন-শয্যার পাশে

সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে।

তার শিখা নিব্‌ল আজ,

সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।

সামনের আকাশে জ্বল্‌বে একলা সন্ধ্যার তারা।

যে বাঁশি বাজিয়েছি

ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,

তার শেষ সুরটি বেজে থামবে

রাতের শেষ প্রহরে।

তার পরে?

যে জীবনে আলো নিবল,

সুর থামল,

সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই

ভরা সত্য ছিল,

সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি,

ভোলাই ভালো।

তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য

কেউ একজন

সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো

বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

শেষ সপ্তক

আমার এতদিনকার যাওয়া আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আম কাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো একটি গোধূলির ধূসরমুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।

শেষ সপ্তক

যে পথিক অস্ত-সূর্য্যের

ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে

সে তো ধূলোর হাতে উজাড় করে দিলে

সমস্ত আপনার দাবী ;

সেই ধূলোর উদাসীন বেদীটার সামনে

রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য ;

ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,

যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,

যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে

যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজ্‌ছে ঘণ্টা

জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের

মিলের মাত্রা রেখে ॥

সাত

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হোলো,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল ;—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।
তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জ্জন।
আর, যে সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,
যে বিপুল সম্ভাব্য
সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন
অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—
যা ছিল অপ্রজ্জ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে
তাও নিব্‌ল।

যা বিকোলো, আর যা বিকোলো না,—
দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।
কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজ্‌ল না তার ক্ষতি।
ঐ নির্ম্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্ত্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে'
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে;
অবশেষে যুগান্তে তা'রা তেমনি ক'রেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশ্রান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ।

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠ্‌ছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্চে ধ্যানের তরঙ্গতলে।

শেষ সপ্তক

প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়॥

আট

মনে মনে দেখলুম
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা
যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে
আপন তপস্যার আসন থেকে।

দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্য্যম্পশ্য নিভৃতে
ছবি আঁকছে গুণী
গুহাভিত্তির পরে,
যেমন অন্ধকার পটে
সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি।
সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায়নি বাইরের দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে।

হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের।
নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্ত্তিতে।

নাম-ক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্ম্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
তোমাদের নিঃশব্দ বাণী
রয়েছে এই গুহায়,
বল্‌ছে—নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে'
সদ্য বর্ত্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেষণ এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ!

শেষ সপ্তক

আজ আমার দ্বারের কাছে
সজ্‌নে গাছের পাতা গেল ঝ'রে,
ডালে ডালে দেখা দিয়েছে
কচি পাতার রোমাঞ্চ ;
এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া
চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ায়
গাছে গাছে দোলাদুলি ;
উড়্‌তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখীর কলকাকলীতে
বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আল্‌পনা।

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চল্‌তি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মল্‌ করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভ'রে এই তো পাচ্চি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এই রকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য,
রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষ বেদনা।
সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,
গর-ঠিকানার পথিক।
তার যেটুকু সত্য
তা সেই মুহূর্ত্তেই পূর্ণ হয়েছে,
তার বেশি আর বাড়্‌বে না একটুও,
নামের পিঠে চ'ড়ে।

বর্ত্তমানের দিগন্ত পারে
যে-কাল আমার লক্ষ্যের অতীত
সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে
যখন ঠেলাঠেলি চলবে
লক্ষ লক্ষ নামে নামে,

তখন তারি সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে
বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার
আমারো নামটা,
ধিক্ থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক্ আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি।

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

নয়

ভালোবেসে মন বললে—
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি;
দিতে পারবে কেন?
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্ব্বাক্ অনতিক্রমণীয়।
তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।

শেষ সপ্তক

যাকে বল্‌তে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয়নি,
তার নক্‌সা শেষ হবে কবে ?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কা'র ?
নামটা রয়েছে যে-পরিচয়টুকু নিয়ে,
টুক্‌রো-জোড়া-দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।

চারদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙীন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে ;
হাওয়ায় লাগে শীত বসন্তের ছোঁওয়া ;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হোলো ?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?
জীবন-ভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্ম্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,

আর একপ্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হোলো শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সঙ্কীর্ণ সঙ্গমস্থলে।
তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায়নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,—
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জ্জনা।
এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে?

যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হোতে চল্‌ল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষী।

অপ্রকাশের পর্দ্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্প-প্রয়াসকে ;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বল্‌লে "জানি", তারা জান্‌ল না॥

দশ

মনে হয়েছিল আজ সব ক'টা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্য্যন্ত এমনি ক'রে
অন্ধকার হাৎড়িয়ে বেড়ানো।
ভিৎ-সুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

এমন সময়ে সদ্যবর্ত্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্ত্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।

দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।
কোন্ দুর্দ্দাম সর্ব্বনাশের
বজ্র-ঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুঙ্কার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝঙ্কৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কতকালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,
কত যুগের জ্বলৎধারা মর্ম্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্ত্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।
আর তার বাইরে পড়ে আছে
নির্ব্বাপিত বেদনার পর্ব্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,
জ্যোতির্হীন, বাক্যহীন, অর্থশূন্য॥

একত্রিশ

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতসবাজী।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচু শাক, কাঁচা আম, সজ্‌নের ডাঁটা।

ছ'টা বাজ্‌ল ইস্কুলের ঘড়িতে।
ঐ ঘণ্টার শব্দ আর সকাল বেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রং
মিলে গেছে আমার মনে।

আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবী গাছের তলায়।
পূবদিক থেকে রোদ্দুরের ছটা
বাঁকা ছায়া হান্‌ছে ঘাসের পরে।
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায়।
মনে হচ্চে যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকন সবুজের আড়ালে।

চৈত্রমাস ঠেক্‌ল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দুর্ব্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রং হারিয়ে সঙ্কুচিত।

হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে,—
বিদেশী হাওয়া চৈত্রমাসের আঙিনাতে।
গায়ে দিতে হোলো আবরণ অনিচ্ছায়।
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠ্‌ছে সিরসিরিয়ে,
টল্‌মল্‌ করছে নাল গাছের পাতা,
লাল মাছ ক'টা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

নেবু ঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে।
তার মধ্যে থেকে দেখা যায়
গেরুয়া পাথরের চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি।
সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে
উদাসীন;
ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে।
শিল্পের ভাষা তার,
গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই
ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্চে
সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ঐ মূর্ত্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।

মানুষ আপন গূঢ় বাক্য অনেক কাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ ক'রে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

সাতটা বাজ্‌ল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুক্‌ল বাগানে।
পিঠে দুল্‌ছে ঝালরওয়ালা বেণী,
হাতে কঞ্চির ছড়ি;
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস,
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
হাঁস দুটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্য্যাদায় গম্ভীর,
সকলের চেয়ে গুরুতর ঐ মেয়েটির দায়িত্ব।
জীবপ্রাণের দাবী স্পন্দমান
ছোট্ট ঐ মাতৃমনের স্নেহরসে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চ'লে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ ক'রে
আপন আনন্দ ভাণ্ডার থেকে ॥

বারো

কেউ চেনা নয়

সব মানুষই অজানা।

চলেছে আপনার রহস্যে

আপনি একাকী।

সেখানে তার দোসর নেই।

সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়

মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।

সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে

বাঁধা মাইনের কাজ করে সে।

থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

এমন সময় কোথা থেকে

ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে,

সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,

বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।

সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব্ব, অসাধারণ,

তার জুড়ি কেউ নেই।

তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলায়
বাঁধতে হয় গানের সেতু,
ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।
মন বলে
চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,—
রাত্রি যেমন আসে
পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।
তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাইনে,
সেই অনুভব
"তিলে তিলে নূতন হোয়।"

———

তেরো

রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে
বাউল এসে থাম্‌ল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, "অচিন পাখী উড়ে আসে খাঁচায়" ;
দেখে অবুঝ মন বলে—
অধরাকে ধরেছি।

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে ;
জানলে না এইগানে তোমারই কথা।
তুমি রাগিণীর মতো আসো যাও
একতারার তারে তারে।

সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে;
ওতে রং লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে',
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে,
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখী তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাকো,
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখীর পাখায়,
স্তকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়॥

জ্যোৎস্না

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখীর শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থম্‌থমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লি-ঝঙ্কৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে ;
বল্‌লে, "তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।"
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্ত্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সঙ্কোচ গিয়েছিল কেটে।

সেই মুহূর্ত্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হোলো অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্ত্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হোলো আগামী জন্ম জন্মান্তরে।
সেই মুহূর্ত্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।

শেষ সপ্তক

প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে

মূর্ত্তিমান অসংখ্যতার কাছে

আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।

তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া

যার তলায় দু-বেলা জল দাও আপন হাতে,

সেও প্রধান হয়ে উঠে'

তার ডাল-পালার বাইরে

সরিয়ে রাখবে আমাকে

বিশ্বের বিরাট অগোচরে।

তা হোক্,

এও গৌণ॥

পনেরো

শ্রীমতী রাণী দেবী

কল্যাণীয়াসু

(১)

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্দ্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।

আকাশের সখ ঘরে মেটাতে চাইনে ;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।

বেশ লাগ্‌ছে।
দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি—
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আল্‌গা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

মনে পড়ে একদিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পাল্কীতে অপরাহ্ণে;
কাহার ছিল আটজন।
(তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্ত্তি;
আপন কর্ম্মের অপমানকে প্রতিপদে সে চল্‌ছিল পেরিয়ে
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখী যেমন যায় উড়ে'।
দেবতা তার সৌন্দর্য্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান।)

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম ;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাইনে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তা'র প্রাচীর,
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা ;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতিমুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
জীবনের চারদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তাঁর আসন, তার মুক্তি।

(২)

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই ব'লে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিইনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাক-পিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া ;
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে ;

এতদিন এই সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।
মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারি খোঁজে।

আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, দেখলেম।
সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে,
তিনিও নীরবে বলছেন, দেখলেম।
আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সঙ্কেত এল,
"খোলো আবরণ।" বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে ;
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে ;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।

(৩)

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য ;
নির্ব্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।—

অমিতার আনন্দ সম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা,
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া।

আজ আদিসৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্তের ধ্বনি
পৌঁছল আমার চিত্তে,—
যে ধ্বনি অনাদি রাত্রির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে
বলেছিল, "দেখো।"
এতকাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি,
সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি, দেখছি তাই আপনি।
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে' দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।

শেষ সপ্তক

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

(১)

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে ক'রে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলো ছায়ার নাট-বসানো
সে আর-এক কাণ্ড।
সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
প্রজাপতি উড়তে থাকে,
জোনাকি ঝিক্‌মিক করে রাতের বেলা।

শেষ সপ্তক

বনের আসরে এরা সব রেখা-বাহন

হাল্কা চালের দল,

কারো কাছে জবাবদিহী নেই।

কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন;

রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,

তর্জ্জনী তোলে না।

কাজকর্ম্ম প'ড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,

ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-ফলানোর অন্দর মহলে।

এমনি ক'রে, মনের মধ্যে

অনেকদিনের যে-লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে

তার সাহস গেছে বেড়ে।

সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ,

গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দা প্রশংসা॥

(২)

মনটা আছে আরামে।

আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে

খ্যাতির লাগাম পড়েনি।

নামটা আমার খুসির উপরে
সর্দ্দারি করতে আসেনি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে'
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসেনি ;
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
"নাম রক্ষা কোরো।"
অথচ ঐ নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে
স্বয়ং কোনো কাজই করে না।
সব কীর্ত্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে
দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা ;
হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফর্‌মাসটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার ক'রে রাখে
কাজের ঠিক সামনে।
এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা ক'রেই রয়েছে অনুপস্থিত ;—
আমার তুলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী॥

সতেরো

শ্রীমান ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

আমার কাছে শুন্‌তে চেয়েছ

গানের কথা ;

বলতে ভয় লাগে,

তবু কিছু বল্‌ব।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে

আপন সার্থক ভাষা।

মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,

যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

সেই বিরাট বোবা

আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,

ব্যাখ্যা করে না।

বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গী, আছে ছন্দ,

আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।

অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে

বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,

নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;

গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।

তার অন্তরে আছে বহ্নি-তেজের দুর্দ্দাম বোধ

সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,

ঘাসের ফুল থেকে সুরু ক'রে

আকাশের তারা পর্য্যন্ত ।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,

বাহন করতে চায় কথাকে,—

তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,

সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গী, খোঁজে ইসারা,

খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,

দেয় আপনার অর্থকে উল্‌টিয়ে,

নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।

মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

শেষ সপ্তক

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুর সঙ্ঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গী দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্ত্তনে।
সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

আমি যে জানি
একথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হোক্ সুরে হোক্, রেখায় হোক্,
সে পণ্ডিত।
আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,

একথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হোলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।

যদি সুযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে সুধিয়ো,
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়,
তত্ত্বের পার পাবার জন্যে সংজ্ঞার অতীতে॥

আটাশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সুহৃদ্বরেষু

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান ?
আমাদের গর্ব্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী-সত্যকে
—সান্ত্বনা নেই এমন কথায় ;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহঙ্কারে।

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে ;
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।

আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবী করে আমাদের কাছে
সে বলে—"মনে রেখো।"

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবীর,
তার আহ্বান আসে চারিদিক থেকেই
মনের কাছে ;
সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে
অতীতকালের একটিমাত্র আবেদন
কখন্ হয় অগোচর।

যদি বা তা'র কথাটা থাকে
তার ব্যথাটা যায় চ'লে।
তবু শোকের অভিমান
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে।
স্পর্দ্ধা ক'রে প্রাণের দূতগুলিকে বলে—
খুল্‌ব না দ্বার।
প্রাণের ফসল ক্ষেত বিচিত্র শস্যে উর্ব্বর,
অভিমানী শোক তারি মাঝখানে
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি,—

সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
তার খাজনা দেয় না জীবনকে।
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।
সেই অভিযোগে তার হার হোতে থাকে দিনে দিনে।
কিন্তু চায় না সে হার মান্‌তে ;
মনকে সমাধি দিতে চায়
তার নিজকৃত কবরে।

সকল অহঙ্কারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহঙ্কার।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা ;
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,
জিন নেই, লাগাম নেই,
ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভর সন্ধেবেলায় ;
ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।
আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা,
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

যে ছিল ভাবীকালে
আগে হতে মনের মধ্যে
ফিরছিল তারি আবছায়া,
যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে
ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অন্ধকারে।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,
আধোজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রংটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে ;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।
তখন ভালোবাসার যে কল্পরূপ ছিল মনে
তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের
দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত।
এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে ম'রে,
অনুভবে পাইনে
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।

শেষ সপ্তক

ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,

যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,

সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,

যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি ॥

ত্রিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা
আকাশের নিচে
রাঙামাটির পথের ধারে।
ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।
দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন,—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্ল নবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে ;—
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন।
ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্ম্মম ওর ইঙ্গিত।

সভার লোকেরা বল্‌লে,—
"একটা কিছু শোনাও, কবি,
রাত গভীর হয়ে এল।"

খুললেম পুঁথিখানা,
যত প'ড়ে দেখি
সঙ্কোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
এত যত্নের ধন।
এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অন্তঃপুরিকা,
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে ;
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চল্‌তে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে, বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝঙ্কৃত হয় প্রাচীরঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে।
বাধা পায় তা'রা নৈপুণ্যের বন্ধনে।

এই পথের-ধারের সভায়,
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন
মুছে ফেলেছে সিঁদুর ;
যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,
যারা তীর্থযাত্রী ;
যাদের অসঙ্কোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন ;
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার ;
কত রৌদ্রতপ্ত দিনে
কত অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়,—
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে।
কোথা থেকে আনব তাদের
নিন্দা প্রশংসার ফাঁদে টেনে।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে।

ওরা বললে, "কোথা যাও কবি?"

আমি বললেম,—

"যাব দুর্গমে, কঠোর নির্ম্মমে,

নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান॥"

একুশ

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হোলো অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।

তা'রা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোলো অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

অব্যক্তে তা'রা ছিল প্রচ্ছন্ন,
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে ;—
তা'রা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দ্দান্ত আবেগ।

কোন্ কেন্দ্রে জ্বল্‌ছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আস্‌বে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত
পাখা যাবে খ'সে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে

শেষ সপ্তক

আলোক-আঁধারের পর্য্যায়ে,

নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির

অগোচরে।

সেখানকার নিমেষের পরিমাণে

এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে

ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল

আঁকা হচ্চে মোছা হচ্চে।

বুদ্‌বুদের মতো উঠ্‌ল মহেন্দজারো,

মরুবালুর সমুদ্রে, নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।

সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর,

দেখা দিল বিপুল বলে

কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া

ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে,

কাঁচা কালীর লিখনের মতো

লুপ্ত হয়ে গেল

অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো

অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে।

বীরেরা বলেছিল
অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার কীর্তিপ্রতিমা ;
তুলেছিল জয়স্তম্ভ।
কবিরা বলেছিল, অমর করবে
সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে,
রচেছিল মহাকবিতা।
সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-যোজন পত্রপটে
লেখা হচ্ছিল
ধাবমান আলোকের জ্বলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।
সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির
উচ্চারণ কালের মধ্যে
ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্দ্ধিত জাতির ইতিহাস।
আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের
নিমেষহীন আলোর নিচে
আমার লতাবিতানে ব'সে
নমস্কার করি মহাকালকে।

অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যাক্ উড়ে'।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃত ভরা
মুহূর্ত্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে ?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না ;
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার ক'রে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায় ॥

বাইশ

সুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্চি—
পৃথক হব আমরা।

ও এসেছে কতলক্ষ পূর্ব্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;
সে সব বেদনা বহু দিনরাত্রিকে মথিত করেছে
সুদীর্ঘ ধারাবাহী অতীতকালে ;
তাই নিয়ে ও অধিকার ক'রে বস্‌ল
নবজাত প্রাণের এই বাহনকে,
ঐ প্রাচীন, ঐ কাঙাল।

আকাশ-বাণী আসে ঊর্দ্ধলোক হতে,

ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।

নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,

ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে পলে পলে,

বাসনার দহনে,

ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে

যে-আমি জরাহীন।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ও জিতে' নিয়েছে আমার মমতা,

তাই ওকে যখন মরণে ধরে

ভয় লাগে আমার

যে-আমি মৃত্যুহীন।

আমি আজ পৃথক হব।

ও থাক্ ঐ খানে দ্বারের বাইরে,

ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।

ও ভিক্ষা করুক্, ভোগ করুক্,

তালি দিক্ বসে বসে

ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;

জন্মমরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা ক্ষেতটুকু আছে
সেইখানে করুক্ উঞ্ছবৃত্তি।
আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে,
ঐ দূরপথের পথিককে,
দীর্ঘকাল ধ'রে যে এসেছে
বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে।
উপরের তলায় ব'সে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ার সুখ দুঃখের আলো আঁধারে।
দেখব যেমন ক'রে পুতুল নাচ দেখে ;
হাসব মনে মনে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসবের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা ॥

তেইশ

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

কল্পনা করছি,—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্ত্তেই
বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলি তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখ্‌ছি আপনার বাইরে,—

অন্তযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গম্ভীর কৌতূহল।
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্ব্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্য্যন্ত ভাষা পায়নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগ্‌ল যেন।

শেষ সপ্তক

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখ্‌তে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দ্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ ॥

চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রং-বেরঙের সুতোগুলো থাক্,
থাক্ প'ড়ে ঐ জরির ঝালর।
শুনে' ঘরের লোকে বলে,
"যদি না বাঁধো জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী ক'রে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে?"
আমি বলি,
"আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্ণে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,
তাই নিয়ে খুসি থাকো।"

বন্ধু বল্‌লে,
"এলেম তোমার ঘরে
ভরা-পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি ক্ষ্যাপার মতো বল্‌লে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন?"

আমি বলি, "চলো না ঝরনা তলায়,
ধারা সেখানে ছুট্‌ছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা, কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোলো গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্ব্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো,
কা'কে ধরতে চায় ঐ জলের ঝিকিমিকির মধ্যে?

সভার লোকে বল্‌লে,
“এ যে তোমার আবাঁধা বেণীর বাণী,
বন্দিনী সে গেল কোথায় ?”
আমি বলি, “তাকে তুমি পারবে না আজ চিন্‌তে,
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্চে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।”
ওরা বল্‌লে, “তবে মিছে কেন ?
কী পাবে ওর কাছ থেকে ?”
আমি বলি, “যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।
পাতার ভিতর থেকে
তার রং দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপ্‌টায়।
চারদিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় ক'রে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহুরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মান্‌বার জন্যে
তার আপন স্থানে॥”

পঁচিশ

পাঁচিলের এধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
ফুলের কেয়ারিতে
কাঁচি-ছাঁটা বেগ্‌নি গাছের পাড়।
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর ক'রে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের;
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।

বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ আদরে অলঙ্কৃত,
কিন্তু পাহারা চারদিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি।
পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপ্‌টাস
খাড়া উঠেছে ঊর্দ্ধে।
পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।
অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।

শেষ সপ্তক

ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে ;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের ;
মর্ম্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো ;
আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
বল্‌লেম,—"টবের কবিতাকে
রোপন করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়া-ভাঙা ছন্দের অরণ্যে ॥"

ছাব্বিশ

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুত-বিচ্ছুরিত আলোক-সঙ্কেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
ভিড় করেছে তা'রা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

সঙ্কীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।
প্রতিদিনের অভ্যস্ত কথার
মূল্য হোলো দীন;
অর্থ গেল মুছে।

শেষ সপ্তক

আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত
হেমন্তের বেলা,
তার সুর পড়েছে চাপা।
সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—
"ভালোবাসি।"
সঙ্কোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায়।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ ক'রে নিতে চাই
আমার বাণী।
দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক
অনায়াসে পার হয়েছে,
শাখাব্যূহের জটিলতা,
জয় ক'রে নিয়েছে চারদিকে নিস্তব্ধ অবকাশ।
তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে
উত্তীর্ণ হয়ে যায়
সূর্যোদয় মহিমার মাঝে।

সেই পথ দিয়ে দক্ষিণ বাতাসের স্রোতে
অনাদি প্রাণের মন্ত্র—
তোমার নব কিসলয়ের মর্ম্মে এসে মেলে
বিশ্ব হৃদয়ের সেই আনন্দ মন্ত্র—
"ভালোবাসি।"

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়
সুদূরে ;
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্দ্ধলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
"ভালোবাসি।"

শেষ সপ্তক

যেদিন যুগান্তরের রাত্রি হোলো অবসান
আলোকের রশ্মিদূত
বিকীর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী
আকাশে আকাশে।

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণ-সমুদ্রের মহা প্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্র-বচন।

এই বাণীই দিনেদিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে
অস্ত-সাগরের নির্জ্জন ধূসর উপকূলে।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এজন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হোক্ উদ্ভাসিত—
"ভালোবাসি।"

সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকাল বেলা,
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।
এক নিমেষেই ঘট যায় ভ'রে
তারপরে কেবলি তার কানা ছাপিয়ে ওঠে,
জল পড়তে থাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
বিনা কাজে বিনা ত্বরায় ;
ঐ যে সূর্য্যের আলোয়
উপ্‌চে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,
আমার খেলা ঐ সঙ্গেই ছ'ল্‌কে ওঠে
মনের ভিতর থেকে।

সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারি পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।
ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের ধ্বনি
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,
নেমে যায় যেখানে ঐ বুনোপাড়ার মানুষ
হাট করতে আসে,
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
বাঁকে বাঁকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,
তার বলদের গলায়
রুনুঝুনু ঘণ্টা বাজে,
তার বলদের পিঠে
শুক্‌নো কাঠের আঁঠি বোঝাই-করা।

এমনি ক'রে
প্রথম প্রহর গেল কেটে।

রাঙা ছিল সকাল বেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,
শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
উর্দ্ধমুখ পর্ব্বতের উধাও চিত্তে
নিঃশব্দ জপ-মন্ত্রের মতো।

বেলা হোলো,
ডাক পড়ল ঘরে।
ওরা রাগ ক'রে বল্‌লে,—
"দেরি করলি কেন?"
চুপ ক'রে থাকি নিরুত্তরে।

ঘট ভরতে দেরি হয় না
সে তো সবাই জানে;
বিনাকাজে উপ্‌চে-পড়া-সময় খোওয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে?

আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পাল্‌টিয়ে দিয়ে
কখনো-বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্য্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত অবগুণ্ঠনের নিচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বালো
সাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্চ্ছনা।

সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।
যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে
গোপনে রেখেছ তার 'পরে
সুরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি,
তোমাকে এমনি ক'রেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্য্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবি-রশ্মিগ্রথিত-দিনরত্নেরমালা
দুল্‌ছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটিবৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবি-চিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী
সেই মুহূর্ত্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্য্যায়ের আবর্ত্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই,
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে কথা মান্‌বই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।

কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব পথিককে
নিঃশব্দে সঙ্কেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে ॥

———

উনত্রিশ

অনেককালের একটি মাত্র দিন
কেমন ক'রে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।
কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল
চলাচলের পথের বাইরে।
যুগের ভাসান্ খেলায়
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাঁকের মুখে
কেউ জানতে পারে নি।
মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝ'রে ;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে ;
চৈত্রের রৌদ্রে আর শর্ষের ক্ষেতে
কবির-লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।

আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে
কোনো ঋতুর কোনো তুলির
চিহ্ন লাগেনি।

একদা ছিলেম ঐ দিনের মাঝখানেই।
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে
নানা কিছুর মধ্যে ;
তা'রা সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশে পাশে সাম্‌নে।
তাদের দেখে গেছি সবটাই
কিন্তু চোখে পড়েনি সমস্তটা।
ভালো বেসেছি,
ভালো ক'রে জানিনি
কতখানি বেসেছি।
অনেক গেছে ফেলাছড়া ;
আন্‌মনার রসের পেয়ালায়
বাকি ছিল কত।

সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে
আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।

কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।
তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে
তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ।
তনু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।
ঠিকমতো সময়টি পাইনি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,
সে সব বৃথা কথা।
হোতে হোতে বেলা গেছে চলে।
আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্ত্তি,—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্চে কী একটা কথা বলবে,
বলা হোলো না,—
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই॥

ত্রিশ

যখন দেখা হোলো
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস ;
সে আমাকে সুধালো,—
"তুমি খুঁজে বেড়াও কা'কে ?"
আমি বললেম—
"বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে,
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।"

শুনে সে রইল চুপ ক'রে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।
আমার মনে লাগল ব্যথা,
বল্‌লেম, "কী ভাবছ তুমি ?"

ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বল্‌লে,—
"কেমন ক'রে জান্‌বে তাকে পেলে কিনা,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটি মাত্রকে।"

আমি বললেম,
"আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা ;
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতর।"

কোনো কথা সে বল্‌ল না।

কচি শ্যামল তা'র রঙটি ;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা।
চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না ব'লে।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায়নি
কোন্‌খানে সীমা
তার আঙিনাতে।

দেখা হোলো।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ঐটুকু নিয়ে।
তার পরে সে চলে গেছে ॥

একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,
আমার একতলার ঘরখানা
দিয়েছি ওদের ছেড়ে।
কাগজে পেয়েছি প্রশংসাবাদ,
ওরা মিটিং ক'রে আমাকে পরিয়েছে মালা।

আজ আট বছর থেকে
শূন্য আমার ঘর।
আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি
সেই ঘরের একটা ভাগে
টেবিলে পা তুলে'
কেউ পড়ছে খবরের কাগজ,
কেউ খেলছে তাস,
কেউ করছে তুমুল তর্ক।

তামাকের ধোঁয়ায়
ঘনিয়ে ওঠে বদ্ধ হাওয়া,
ছাইদানিতে জম্‌তে থাকে,
ছাই, দেশালাইকাঠি,
পোড়া সিগারেটের টুক্‌রো।

এই প্রচুর পরিমাণ ঘোলা আলাপের
গোলমাল দিয়ে
দিনের পর দিন
আমার সন্ধ্যার শূন্যতা দিই ভ'রে।
আবার রাত্তির দশটার পরে
খালি হয়ে যায়
উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ।
বাইরে থেকে আসে ট্র্যামের শব্দ,
কোনোদিন আপন মনে শুনি
গ্রামোফোনের গান,
যে কয়টা রেকর্ড আছে
ঘুরে ফিরে তারি আবৃত্তি।

আজ ওরা কেউ আসে নি ;
গেছে হাবড়া ষ্টেশনে
অভ্যর্থনায় ;
কে সন্ত এনেছে
সমুদ্র-পারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে।

নিবিয়ে দিয়েছি বাতি।

যাকে বলে“আজকাল”
অনেকদিন পরে
সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকীব
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে।
আটবছর আগে
এখানে ছিল হাওয়ায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারি একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব কিছুতেই।
যেন কী শুনব ব’লে
রইল কান পাতা ;

সেই ফুলকাটা ঢাকা-ওয়ালা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

পিতামহের আমলের
পুরোনো মুচুকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সাম্‌নে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ওপারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌ছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,
টনটন্‌ করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ঐ তারার ছায়া।

অনেক কথার মধ্যে
মনে পড়ছে ছোট্টো একটি কথা।

সেদিন সকালে
কাগজ-পড়া হয়নি কাজের ভিড়ে ;
সন্ধে বেলায় সেটা নিয়ে
বসেছি এই ঘরেতেই,
এই জানলার পাশে
এই কেদারায়।
চুপি চুপি সে এল পিছনে
কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে।
চল্‌ল কাড়াকাড়ি
উচ্চ হাসির কলরোলে।
উদ্ধার করলুম লুঠের জিনিষ,
স্পর্দ্ধা ক'রে আবার বস্‌লুম পড়তে।
হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো।
আমার সেদিনকার
সেই হার-মানা অন্ধকার
আজ আমাকে সর্ব্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে',
যেমন ক'রে সে আমাকে ঘিরেছিল
দুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা
বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে,
সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জ্জনে।

হঠাৎ ঝর্‌ঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ ক'রে,
দরজার কাছের পর্দ্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল অস্থির হয়ে।
আমি ব'লে উঠলেম,—
"ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণ-লোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের সাড়িখানি প'রে?"
একটা নিঃশ্বাস লাগ্‌ল আমার গায়ে,
শুন্‌লেম অশ্রুতবাণী,—
"কার কাছে আসব?"
আমি বল্‌লেম,
"দেখতে কি পেলে না আমাকে?"
শুনলেম,
"পৃথিবীতে এসে
যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চির-কিশোর বঁধু
তাকে তো আর পাইনে দেখতে
এই ঘরে।"

সুধালেম, "সে কি নেই কোথাও ?"
মৃদু শান্তস্বরে বললে,
"সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।"

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব,
হাবড়া ষ্টেশন থেকে
ওরা ফিরেছে ॥

শেষ সপ্তক

বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়্‌কে দিয়ে উস্‌কে দিচ্চে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের কাজ-করা মেজে ;
তার উপরে খান-দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিট্‌মিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দ্দার
কলপ-লাগানো চুল বাব্‌রি-করা,
মিশ্‌ কালো রং,
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব্ব ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।

আমরা সবাই গল্প আঁক্‌ড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউ ডালের মতো
দুল্‌ছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হল্‌দে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠ্‌ল অকারণে।
ন'টার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।

অবাক হয়ে শুন্‌ছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো ব'লে পাঠালো চরের মুখে,
"নমো নমো ক'রে সার্‌লে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।"

মোড়লের কাছে পত্র দেয়
　পাঁচ হাজার টাকা দাবী ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।
রাজার খাজনা-বাকীর দায়ে
　　বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
　　দেনা শোধ ক'রে দেয় রঘু।
বলে—"অনেক গরীবকে দিয়েছ ফাঁকি,
　　　কিছু হাল্‌কা হোক তার বোঝা।"

　　একদিন তখন মাঝরাত্তির,
　　　ফিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,
　　　নদীতে তার ছিপের নৌকো
　　　　অন্ধকারে বটের ছায়ায়।
　　　পথের মধ্যে শোনে—
　　　　পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
　　　　বর ফিরে চলেছে বচসা ক'রে;
　　কনের বাপ পা আঁক্‌ড়ে ধরেছে বরকর্ত্তার।
　　　　এমন সময় পথের ধারে
　　　　　ঘন বাঁশ বনের ভিতর থেকে
　　　　হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।

শেষ সপ্তক

আকাশের তারাগুলো
যেন উঠ্‌ল থরথরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পাল্কী পড়্‌ল পথের মধ্যে ;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—
"দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।"
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পাল্কী থেকে টেনে বের করলে বরকে,
বরকর্ত্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁক উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি;
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়,
শিবের বিয়ের রাত্তে ভূত প্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্ব্বাঙ্গ,
মুখে ভুসোর কালী।

শেষ সপ্তক

বিয়ে হোলো সারা।

তিন পহর রাতে

যাবার সময় কনেকে বল্‌লে ডাকাত

"তুমি আমার মা,

দুঃখ যদি পাও কখনো

স্মরণ কোরো রঘুকে।"

তারপরে এসেছে যুগান্তর।

বিদ্যুতের প্রখর আলোতে

ছেলেরা আজ খবরের কাগজে

পড়ে ডাকাতীর খবর।

রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো

সংসার থেকে গেল চলে,

আমাদের স্মৃতি

আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

———

শেষ সপ্তক

তেত্রিশ

বাদ্‌শাহের হুকুম,—
সৈন্যদল নিয়ে এল আব্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদোরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখ দল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দ্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।
থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,—
চারদিকের দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি ;—
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউবা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক-যন্ত্রনায় কাটল আট মাস,
মোগলের হাতে পড়ল
গুরদাসপুর গড়।
মৃত্যুর আসর রক্তে হোলো আকণ্ঠ পঙ্কিল,
বন্দীরা চীৎকার করে
"ওয়াহি গুরু ওয়াহি গুরু",
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন।

নেহাল সিং বালক ;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে'।

শেষ সপ্তক

চোখে যেন স্তব্ধ আছে

সকাল বেলার তীর্থযাত্রীর গান।

সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,

দেবশিল্পী কুঁদে' বের করেছে

বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।

বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,

শাল গাছের চারা,

উঠেছে ঋজু হয়ে,

তবু এখনো

হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।

প্রাণের অজস্রতা

দেহে মনে রয়েছে

কানায় কানায় ভরা।

বেঁধে আনলে তাকে।

সভার সমস্ত চোখ

ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে করুণায়।

ক্ষণেকের জন্যে

ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হোতে

শেষ সপ্তক

এমন সময় রাজধানি থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।

যখন খুলে দিলে তা'র হাতের বন্ধন,
বালক সুধালো, আমার প্রতি কেন এই বিচার ?
শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে
শিখধর্ম্ম নয় তার ছেলের,
বলেছে, শিখেরা তাকে জোর ক'রে রেখেছিল
বন্দী ক'রে।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হোলো
বালকের মুখ।
ব'লে উঠল,—"চাইনে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।"

চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চল্‌তে চল্‌তে দেখেছি
পুরাণে কীর্ত্তিত কত দেশ আজ কীর্ত্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;
বিরাট অহঙ্কার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় প্রণত,
সেই ধূলার পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধূলায় ফেলে চিহ্ন,—
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপ্‌টা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা ॥

পঁয়ত্রিশ

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

খাঁচার পাখীর কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্ম্মর,
আছে করুণ বিস্মৃতি।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—
এ তো কেবলি দেখার জাল-বোনা নয়।—
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিগ্বলয়ের ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সঙ্কেতে।

শেষ সপ্তক

দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,

রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।

শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য ?

ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আস্‌ছে গানের আহ্বান,

তার সত্য মিল্‌বে কোন্‌খানে ?

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।

তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,

মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।

অন্ধকারে সে দেখ্‌ছে অভাবিতের স্বপ্ন।

স্বপ্নেই কি তার শেষ ?

উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ ;

আজ নেই, তাই ব'লে কি নেই কোনোদিনই ?

ছত্রিশ

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে।
বেগ্‌নি-ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধবট
ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পর্য্যন্ত।
ফল্‌সা গাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চম্‌কে বেড়ায় উড়ে'
ধূলোর সাঙাৎ হয়ে।

কাজ-ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্ম্মরধ্বনিতে মিশে'
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠ্‌ছে বেজে,—
"আমি আছি।"

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছ ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত :
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।
এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নিচে
শিকড়ে শিকড়ে তা'র শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী—
"আমি আছি,"
চন্দ্রসূর্য্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

অলস মনের শিওরে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে-আমি ধূলিধূসর
সামান্য দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল

শেষ সপ্তক

সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্ত আলোকে।

সে-সব ছুর্ম্মূল্য নিমেষ

কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে ;

এইটুকু জানি—

তা'রা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,

জাগিয়েছে আমার মর্ম্মে

বিশ্বমর্ম্মের নিত্যকালের সেই বাণী

"আমি আছি।"

সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণ তলে।
তোমার তনু হোলো উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরি দহনে,
শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম ক'রে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।
কালোকে আলো করলে,
তেজ দিলে নিস্তেজকে,
ভোগের আবর্জ্জনা লুপ্ত হোলো
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জ্জনে,
অবনত হোলো দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে॥

আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো।

সেদিন সঙ্কীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জ্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারি আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে'।

খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে' সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।

রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপ-নিকুঞ্জের আকূতি।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি ;
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গ'ড়ে তুল্‌লে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

শেষ সপ্তক

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,

আজ তুমি হয়েছ কবি,

ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া

বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্ম্মতলে

বিরহের বীণা হাতে।

আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি

বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা॥

ঊনচল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে,—
কবি, মৃত্যুর কথা শুন্‌তে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,—
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।
বল্‌ছে সে,—চলো চলো,
চলো বোঝা ফেল্‌তে ফেল্‌তে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।
বল্‌ছে চুপ ক'রে বোসো যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধ'রে
তবে দেখ্‌বে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুক্‌নো নদীতে,
ম্লান হোলো তোমার তারার আলো।

বল্‌ছে,—থেমো না, থেমো না,
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না,
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে।

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।
যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিইনি তাকে কোনো গর্ত্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।
বর্ত্তমান চায় বর্ত্তিয়ে থাকতে।
সে চাপাতে চায়
তার সব বোঝা তোমার মাথায়,
বর্ত্তমান গিলে' ফেল্‌তে চায়
তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।

তার পরে অবিচল থাকতে চায়
আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো
জাগরণহীন নিদ্রায়।
তাকেই বলে প্রলয়।
এই অনন্ত অচঞ্চল বর্ত্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে॥

চল্লিশ

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্‌
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
—অথর্ব্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন,—
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে?
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।
কত জরা কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চারদিকে,
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল,

শেষ সপ্তক

প্রতিদিন ভোর-বেলার আলোতে
ধ্বনিত হোলো তার বাণী,—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

দিন এগোতে থাকে,
তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,
আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,
বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল
আবর্ত্তিত হোতে থাকে
দূর হতে দূরে।

কখন্ দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,
থেমে যায় তাপ,
নেমে যায় ধুলো,
শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,
আলোর যবনিকা সরে যায়
দিক্‌সীমার অন্তরালে।

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে,
ম্লানিহীন অন্ধকারে

জেগে ওঠে বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"
শতাব্দীর পর শতাব্দী
আপনাকে ঘোষণা করে
মানুষের তপস্যায় ;
সে-তপস্যা
ক্লান্ত হয়,
হোমাগ্নি যায় নিবে,
মন্ত্র হয় অর্থহীন,
জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন
ম্রিয়মান শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।

অবশেষে কখন
শেষ সূর্য্যাস্তের তোরণদ্বারে
নিঃশব্দচরণে আসে
যুগান্তের রাত্রি,
অন্ধকারে জপ করে শান্তিমন্ত্র
শবাসনে সাধকের মতো।
বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চ'লে,

নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়,—
তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জ্জনা ;
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে।
পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত।

বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে
ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।

দিন এগোলো।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ-পথে ও-পথে।

ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিঃশ্বাস
শুক্‌নো পাতা ওড়ালো দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধূলায় হোলো নিবিড়।
আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুর কামনা
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
ঘুরে বেড়ালো ধরাতলে
ফলের বাগানে ফসলের ক্ষেতে
আহূত অনাহূত।
আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হোলো সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে॥

১লা বৈশাখ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন।

একচল্লিশ

হাল্‌কা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হোক
গিরি নদীর মতো।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থাম্‌ল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে ব'সে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝঙ্কার দিতে
আজো সে সঙ্কোচ করে না।

আমি সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহের
রহস্য-সখা।
তিনি অর্ব্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।
তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,
তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ।
তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য্য মেঘমেদুর অম্বরে,
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্য্যাদা পাবার ;
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।
তাঁর বেলাভূমিতে
ভঙ্গুর সৈকতের ছেলেমানুষী
প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের।

শেষ সপ্তক

আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্য দলে,
তাই আমার বার্দ্ধক্যের শিরোপা
হঠাৎ নেন কেড়ে
ফেলে দেন ধূলোয়—
তার উপর দিয়ে নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী
পাঁচ রঙের তালি-দেওয়া আল্‌খাল্লা প'রে।
যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামী সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে,
ও সাজ আর টিঁকতে পায় না
আন-মনার অনবধানে।

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।

এসো আমার অমানী বন্ধুরা

মন্দিরা বাজিয়ে—

তোমাদের ধুলো-মাখা পায়ে

যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে

লজ্জা পাব না ॥

বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত
প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পারো।
বোসো তোমার কেদারায়,
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়্‌গুড়িতে,
উছ্‌লে ওঠে আলাপ
তোমার ভিতর থেকে
হাল্‌কা ভাষায়,
যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,
তোমার কৌতুকে-ফেনিল মনের
কৌতূহলের উৎস থেকে।

ঘুরেছ নানা জায়গায়, নানা কাজে,
আপন দেশে, অন্য দেশে।
মনটা মেলে রেখেছিলে চারদিকে,
চোখটা ছিলে খুলে।

মানুষের যে-পরিচয়
তার আপন সহজভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,
সামান্য হোলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হোলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায়নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতের দেখা সহজ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়ান্সে,
শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায়;
পার্সি জবানীও জানা আছে।
গিয়েছ সমুদ্র-পারে,
ভারতে রাজসরকারের
ইম্পীরিয়ল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে
'হেঁইয়ো' ব'লে দিতে হয়েছে টান।
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি
মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়,

পুঁথির থেকেও কিছু,
মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।

তবু সব-কিছু নিয়ে
তোমার যে-পরিচয় মুখ্য
সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।
তুমি গল্প জমাতে পারো।
তাই যখন-তখন দেখি,
তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে,
কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো
কেউ বয়সে বেশি।

গল্প করতে গিয়ে মাষ্টারি করো না,
এই তোমার বাহাদুরি।
তুমি মানুষকে জানো, মানুষকে জানাও,
জীবলীলার মানুষকে।

এ'কে নাম দিতে পারি সাহিত্য,—
সব-কিছুর কাছে-থাকা।

তুমি জমা করেছ তোমার মনে
নানা লোকের সঙ্গ,
সেইটে দিতে পারো সবাইকে
অনায়াসে,—
সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তক্‌মা পরিয়ে
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না
থম্‌কিয়ে দিতে ভালোমানুষকে।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই।
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা ক'রে রাখেনি।
যেখানে আসন পাতো
গল্পের ভোজে
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখো
লাইব্রেরি ল্যাবরেটরিকে।

একটিমাত্র কারণ,—
মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,—
যে-মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,

বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়,—
যে-মানুষ বাঁচে,
যে-মানুষ মরে
অদৃষ্টের গোলকধাঁধার পাকে।
সে-মানুষ রাজাই হোক্ ভিখিরিই হোক্
তার কথা শুন্‌তে মানুষের অসীম আগ্রহ।

তার কথা যে-লোক পারে বল্‌তে সহজেই
সে-ই পারে,
অন্যে পারে না।
বিশেষ এই হাল-আমলে।
আজ মানুষের জানাশোনা
তার দেখাশোনাকে
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে।
একটু ধাক্কা পেলে
তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিট্‌কে পড়ে
নানা সমস্যা, নানা তর্ক,
একান্ত মানুষের আসল কথাটা
যায় খাটো হয়ে।

আজ বিপুল হোলো সমস্যা,
বিচিত্র হোলো তর্ক,
দুর্ভেদ্য হোলো সংশয়,—
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত ক'রে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।)
এ দুর্দিনে
মাষ্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার।
তাঁর জন্যে ক্লাস আছে
পাড়ায় পাড়ায়—
প্রায়মারী, সেকেণ্ডারি।
গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।
সমুদ্রের ওপারে
একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,
তখন ছিল অবকাশ ;
ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল,
রবিন্‌সন্ ক্রুসো,
সকল বয়সের মানুষের কাছে
ডন্ কুইক্‌সোট্‌।

দুরূহ ভাবনার আঁধি লাগল
দিকে দিকে ;
লেক্‌চারের বান ডেকে এল,
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে
গেল ঘুলিয়ে।
অগত্যা
অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে
এ'কেই বলে গল্প।

বন্ধু,
দুঃখ জানাতে এলুম
তোমার বৈঠকে।
আজকাল-এর ছাত্রেরা দেয়
আজকাল-এর দোহাই।
আজকাল-এর মুখরতায়
তাদের অটুট বিশ্বাস।
হায়রে আজকাল
কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে
মোটাদামের মার্কা-মারা
পসরা নিয়ে।

যা চিরকাল-এর

তা আজ যদি বা ঢাকা পড়ে

কাল উঠবে জেগে।

(তখন মানুষ আবার বল্‌বে খুসি হয়ে,—

গল্প বলো॥)

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর ব'সে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চ'ড়ে চলেছে কাল ;
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে' ধরে,
পায় কিছু পানীয় ;—
পান সারা হোলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধূলায় যায় গুঁড়িয়ে।

তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।
একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জানো না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তা'রা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে;
তার সেদিনকার কান্না-হাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।
তার ভাঙা খেলনার টুক্‌রোগুলোও
দেখিনে ধূলোর পরে।
সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।

তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়;
বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এদিক থেকে ওদিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল একগোত্রের।
সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তারপরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যূষে
রঙীন আভার অস্পষ্টতায়।
তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়ালো
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দ্দেশ্য বেদনার ক্ষ্যাপা সুরে।

সেই শুনে কোনো কোনোদিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশ বনের রং-মাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;

দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা ;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝঙ্কার।

তা'রা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুম-ভাঙা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা ;
ভোরের স্বপ্ন
তারি গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো-বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো-বা জেগেছিল চম্‌কে উঠে'
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রং-করা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগ্‌ত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগ্‌ত মর্ম্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হোত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগ্‌ত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইসারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে-একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।

শেষ সপ্তক

সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জন-সমুদ্রতীরে।
বেলা অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝ-দরিয়ায়;
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ-বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানি-ভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্ত্যপ্রতিমা;
সেবাকে তা'রা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তা'রা
আনে সুধার পাত্র;

ভয়কে তা'রা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
(তা'রা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;)
তা'রা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তা'রা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজো আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।

একতারা ফেলে দিয়ে

কখনো-বা নিতে হোলো ভেরী।

খর মধ্যাহ্নের তাপে

ছুটতে হোলো

জয় পরাজয়ের আবর্ত্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,

ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।

নির্ম্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ

আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,

জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে

নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।

বিদ্বেষে অনুরাগে,

ঈর্ষ্যায় মৈত্রীতে,

সঙ্গীতে পরুষ কোলাহলে

আলোড়িত তপ্ত বাষ্প-নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে

আমার জগৎ গিয়েছে তা'র কক্ষ-পথে।

এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে

পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে

তোমরা এসেছ আমার কাছে।

শেষ সপ্তক

জেনেছ কি,

আমার প্রকাশে

অনেক আছে অসমাপ্ত

অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন,

অনেক উপেক্ষিত ?

অন্তরে বাহিরে

সেই ভালো মন্দ,

স্পষ্ট অস্পষ্ট,

খ্যাত অখ্যাত,

ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে

যে আমার মূর্ত্তি

তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,

তোমাদের ক্ষমায়

আজ প্রতিফলিত,

আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,

তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের

শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে

নিলেম স্বীকার ক'রে,

আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে

আমার আশীর্ব্বাদ।

যাবার সময় এই মানসী মূর্ত্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহঙ্কার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;
(নির্জ্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়॥)

ছয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটীর কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক'রে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।
সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিৎ
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জ্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্ব্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে ;

যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।
সেই মাটির ছাদের নিচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোণা
এক এক মুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে।
মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ।
আমি ভালো বেসেছি
বাংলা দেশের মেয়েকে;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ঐ মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।

শেষ সঞ্চয়

প্রতিদিন আমার ঘরের শুধু মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়
স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙ-শালিকের হাজার খোপের বাসায় ;
সর্ষে তিসির দুই-রঙা ক্ষেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দু-চোখ ভ'রে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘু-ডাকা দুপুর বেলায়,
রাঙা পথের ওপারে,

শেষ সপ্তক

যেখানে শুক্‌নো ঘাসের হল্‌দে মাঠে

চ'রে বেড়ায় দুটি চারটি গোরু

নিরুৎসুক আলস্যে,

ল্যাজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে ;

যেখানে সাথীবিহীন

তাল গাছের মাথায়

সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।

আজ আমি তোমার ডাকে

ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।

এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,

যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,

নব দূর্ব্বাশ্যামলের

করুণ পদস্পর্শে

চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,

নব জীবনের বিস্মিত প্রভাতে॥

পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্য্যাদা।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলেনি।
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।

পর্য্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।
আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পূবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।
যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্চি চিনে'।
সরে এসে দেখ্‌ছি
আমার এতকালের সুখ দুঃখের ঐ সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।

ঋষি-কবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন :—

"ভুবন সৃষ্টি করেছ

তোমার এক অর্দ্ধেককে দিয়ে,—

বাকি আধখানা কোথায়

তা কে জানে।"

সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে

আপন প্রান্তরেখায় ;

দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,

দুই বিরাট আধখানা,—

তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে

শেষকথা ব'লে যাব :—

দুঃখ পেয়েছি অনেক,

কিন্তু ভালো লেগেছে,

ভালো বেসেছি।

ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখ্‌তেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আস্‌ছে,
বেরিয়ে আস্‌ছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে
সূর্য্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্ব্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান ক'রে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,

সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাস্‌ত আমার মুখে চেয়ে।—
আগেকারদিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে।

তারপরে বয়স হোলো,
কাজের দায় চাপ্‌ল মাথার 'পরে।
দিনের পরে দিন
তখন হোলো ঠাসাঠাসি।
তা'রা হারাল আপনার স্বতন্ত্র মর্য্যাদা।
একদিনের চিন্তা আর-একদিনে
হোলো প্রসারিত,
একদিনের কাজ আর-একদিনে
পাত্‌ল আসন।
সেই একাকার-করা সময়
বিস্তৃত হোতে থাকে
নতুন হোতে থাকে না।
একটানা বয়েস কেবলি বেড়ে ওঠে,
ক্ষণে ক্ষণে শমে এসে
চিরদিনের ধূয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে।

আজ আমার প্রাচীনকে নতুন ক'রে নেবার দিন এসেছে।
ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে।
গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে,
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুম-ভাঙার জানলাটার কাছে।
প্রভাত আসবে
আমার নতুন পরিচয় নিতে,
আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে
আমাকে সুধাবে
"তুমি কে ?"
আজকের দিনের নাম
খাট্‌বে না কালকের দিনে।

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে ;—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,
দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্য্যরূপ।

এতকাল তেমনি ক'রে দেখেছি সৃষ্টিকে,

বন্দিদলের মতো

প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা।

তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি

সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।

সামনে দেখ্‌ছি সমুদ্র পেরিয়ে

নতুন পার।

তাকে জড়াতে যাব না

এ পারের বোঝার সঙ্গে।

এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই

যাব একলা

নতুন হয়ে নতুনের কাছে॥